গল্পগুচ্ছ

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মশাটা বার বার উড়ে উড়ে একই জায়গায় বসছে। কনুইয়ের কাছটায়। বার তিনেক চেষ্টা করে অয়ন এবার তৈরি হয়ে বসল মশাটার বধ সুনিশ্চিত করবার জন্য। ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে পাতা রেঞ্চিতে বসে আরো অনেকের মতো অপেক্ষা করছে অয়ন। ডাক্তার সাহার চেমকবারের বাইরে এক্স-রে প্লেট নিয়ে বসে আছে সে। বুকের বাঁ পাশে একটা দমচাপা ব্যথা হত। কিছুক্ষণ থেকে আপনা-আপনি কমে যেত। অয়ন গুত্ব দেয় নি বিশেষ। গত সোমবারে অফিসে অজ্ঞান হয়ে গেল হঠাৎ। মাথায় যেন একটা পাক লাগল, তারপরই ব্যস.... অচেতন। এবার তাই সাবধান হতেই হল। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বুকের ছবি তোলা হয়েছে। সেই এক্স-রে প্লেট এবং ই.সি.জি.রিপোর্ট নিয়ে ডাঃ, প্রমথেশ সাহার চেম্বারে অপেক্ষা করছে অয়ন। প্রায় চল্লিশ মিনিট বসার পর ডাক এল তার।

ডা, সাহা মনোযোগ সহকারে প্লেট এবং ই.সি.জি. রিপোর্ট দেখে বললেন, একটু বড়ো লাগছে-- কার্ডিও ভাসকুলার এক্সপ্যানশান। এই ওষুধগুলো আপাতত খান। একুশদিন পরে আর-একটা এক্স-রে করে আমাকে দেখিয়ে যাবেন। বেশি পরিশ্রম করবেন না। মোটামুটি রেস্টে থাকতে হবে। চিন্তা ভাবনা, মানে স্ট্রেস একদম চলবে না। প্রোটিন, ফ্যাট, সুগার একদম বন্ধ। ভোরে এবং সন্ধ্যায় মর্নিং ওয়াক করবেন খুব হাল্কাভাবে। অয়নের বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। একটা দেড় বছরের ছেলে আছে। বাড়ি ফিরে মন্দিরাকে সব খুলে বলল। কিছু লুকোলো না। এও বলল--- মাকে কিছু বলার দরকার নেই। মন্দিরার মন ভেঙ্গে ছেয়ে গেল। মুখে পড়ল যন্ত্রণার কালো ছায়া। ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকাল। মনের ভার মনেই চেপে বসে রইল। চিন্তার মাছি বার বার ঘুরে ফিরে এসে একই জায়গায় বসতে লাগল। বুকের বাঁ পাশে মৃদু ছুঁচ ফোটাচ্ছে যেন কে। বিকেলের দিকে অম্বল হয়েছিল খুব। বোধ হয় গ্যাসে ঠেলা মারছে এখন। মুখে কোনো চি নেই। রাত্রে প্রায় কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল।

ডাক্তার সাহার পরামর্শমতো অয়ন ভোর পাঁচটায় উঠল মর্নিংওয়াকে বেরোবার জন্য। ছেলেটা উপুর হয়ে ঘুমাচ্ছে। মন্দিরা চিৎ হয়ে। দুচোখ বোজা। অয়ন ডাকল---মন্দিরা ,শুনছ..... আমি একটু বেচ্ছি... মন্দিরা। মন্দিরা নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছে।--- অ্যাই শুনছ... আ-মি...। এক ঠেলা মারল অয়ন। মন্দিরার শারীরিক অবস্থান যেমন ছিল তেমনই রইল। দুচোখ বোজা। হাত-পা টানটান। পায়ের তলা ঠাণ্ডা বরফ। মুখের ওপর ভোরের কুসুম কুসুম আলোয় মাছি ঘুরছে ভনভন করে। কতক্ষণ ধরে কেজানে। দেড় বছরের ছেলেটা কী একটা স্বপ্ন দেখে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

* * * * * *

উদয়ের পুরো নাম উদয়শঙ্কর তরফদার। লোভে পড়ে নববই টাকা দিয়ে একটা ইলিশ মাছ কিনে নিল। কিনে ফেলার পর অবশ্য উদয়ের গা করকর করতে লাগল। বাড়ি ফিরে বৌয়ের কাছে আসল দামটা বলা যাবে না। নইলে গঞ্জনা সইতে হবে বিস্তর। বলবে, রোজগারের মুরোদ নেই, খাওয়ার লোভ আছে ষোলো আনা। এ-সব কথা শুনলে ভীষণ দমে যায় উদয়। রোজগার কি সে করে না? মাসের শেষ সাতদিন প্রচণ্ড টান পড়ে ঠিকই। নুন আনতে পান্তা ফুরোবার দশা। সিকি আধুলি হাতড়ে বেড়ায় এখানে - ওখানে সকালবেলায় বাজার যাবার সময়। তবু সে তো রোজগার করে। বেকার তো নয় এবং বেলাইনে না গিয়ে সৎপথে থেকে রোজগার করছে। একটু এদিক-ওদিক করলে তো সে আর-কিছু না হোক সপ্তাহে একদিন অন্তত মাংস খেতে পারত। দোতলায় একখানা ঘরও এতদিন ধরে আধখেচড়া অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকত ন

া।
বাড়ি ঢুকতেই উদয়ের সহধর্মিণী সুজাতা আাদী গলায় বলল, 'ইলিশ বুঝি! কদ্দিয়ে কিনলে গো?'
বৌয়ের আাদী গলা শুনেই উদয় আন্দাজ করতে পারল ইলিশের সুখ তার কপালে আজ নেই. ঘরে শ্বশুরবাড়ির কুটুম এসেছে।
কুটুমেরা খেয়ে যখন রওয়ানা দিল তখন সন্ধে সাতটা। মাসের শেষে উদয়ের সেই একই অবস্থা। এখানে-ওখানে সিকি আধুলি হাতড়াচ্ছে। ছেলে-দুটো অকম্মার ঢেঁকি। বাপের পয়সায় খাচ্ছে আর মার প্রশ্রয়ে রাতদিন বাপের ওপরই তম্বি করছে। যার বুকের উপর বসে রোয়াবি মারছে তারই দাড়ি ওপড়াচ্ছে।
বড়ো পুত্তুর কোথা থেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বলল, 'ছোটো মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম। সামনের রোববারে ওদের সবাইকে আসতে বলে এলাম। এখানে দুপুরে খাবে। বাবা সেদিন ইলিশটা ফ্যানটাসটিক এনেছিল। রোববারে ওইরকম আর-একটা নিয়ে এসো। দাণ জমবে।' শুনে উদয়ের তো মাথায় হাত। আজ মাসের তেইশ তারিখ। রবিবারে সাতাশ। ছেলের মুখনিঃসৃত বার্তা শুনে সুজাতা তো এদিকে আাদে আটখানা। সে ছেলের তারিফ করে বলল, 'বাঃ, বেশ বুদ্ধি করে বলে এসেছিস তো! আমার তো আজকাল কিছু মনেই থাকে না।'
উদয় শিয়ালদহ ডিভিশনের গুডস ক্লার্ক। তার সহকর্মীরা প্রায় সকলেই উপরি কামায়। মাল খালাসের সময় নিজের টাকা কেটে রেখে পার্টিকে রিসিট দেয়। আর ওয়াগন বুকিং কনফার্মড না হলে তো কথাই নেই। উপরি কামাইয়ের বান ডাকে একেবারে। উদয়ের ও-সব একদম ভালো লাগে না। পুরোপুরি এড়িয়ে চলে ও-সব। আজ পর্যন্ত কোনো পার্টির কাছে হাত পাতে নি। কিন্তু অফিসে বসে বসে সে সাতাশ তারিখের খরচার কথা চিন্তা করে মনে মনে ভীষণ উদ্‌বিগ্ন এবং বিপন্ন বোধ করতে লাগল।
ডলফিন এন্টারপ্রাইজের প্যাকিং রিলিজ হচ্ছিল। দামি কাঠের দামি জিনিসপত্তর। গজেন সান্যাল জলপাই রঙা সাফারি স্যুট পরে তদারকি করছিলেন। মাল যাবে সেকেন্দ্রাবাদে। গজেন সান্যালের মুখে এখনো ব্রিটিশ আমলের এলিটিস্টদের কায়দায় বার্মা চুট। উদয় কোনোদিন এ-সব কেতা-কায়দার তোয়াক্কা করে নি। হিসেবমতো এক্সসাইজ না দিলে তার কাছে এ-সব সাহেব-সুবোও যা আর ছেঁড়াখোঁড়া কেরানিবাবুও তাই। কিন্তু আজকে কে যেন ঠেলাঠেলি করছে ভেতর থেকে। বেলা প্রায় একটা বাজল। ব্রহ্মতালুর ঠিক সোজাসুজি গনগনে মার্তণ্ড।
দুটো ট্রাক বোঝাই হয়েছে ডলফিনের মালে। সান্যালবাবু লিস্টটা একবার ফাইনাল চেকিং করে নিলেন। জলপাই রঙের ঝকঝকে সাফারি। চোখে ফরেন ফাইবারের স ফ্রেমের চশমা। উদয় তরফদারকে আগেই মালের ভাড়া গুনে দিয়েছেন। ট্রাক দুটো রওয়ানা হয়ে গেল। পেছনে রাস্তার ধার ঘেঁসে গজেন সান্যালের রাশভারী কনটেসা দাঁড়িয়ে আছে। মি. সান্যাল গিয়ে দরজা খুললেন। রিসিটটা নেওয়া হয় নি অফিসিয়ালি। উদয়শঙ্কর ডানহাতে রিসিটটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে কনটেসার পাশে। গজেনবাবু হেসে বললেন, 'ওকে, মি. তরফদার..... থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর কো-অপারেশান।' হাত বাড়িয়ে রিসিটটা নিলেন। গাড়ির ভেতরে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ করা গেল না। কারণ গাড়ির ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে উদয় তরফদার। উদয় ধাক্কা মেরে গলা থেকে শব্দগুলো উগরে দিল--- 'এই, ইয়ে... মি. সান্যাল... ওই মানে, ওই মেহগিনি টিকের পালঙ্কটা কিন্তু অ্যান্টিক ছিল... ওগুলোর জন্যে তো সেপারেট সরকারি পারমিট লাগে।
দীপেন, শশাঙ্ক, ঝিজিৎদের মুখে শোনা বিভিন্ন ধরনের কৌশলের একটা চোখকান বুজে আওড়ে দিল। গজেন সান্যাল চমকে উঠে তাকিয়ে রইলেন উদয়ের মুখের দিকে। গাড়ির সিট থেকে আবার রাস্তায় নামলেন গজেনবাবু।
সস্নেহে উদয়ের কাঁধে হাত রাখলেন। উদয়ের মাথা ঝুলে আছে। চোখদুটো বোধ হয় রাস্তায় ধুলো গুনছে। গজেনবাবু নীচু স্বরে বললেন, পঁচিশ বছর ধরে কাজ করছি আপনার সঙ্গে... আপনি তো কোনোদিন কিছু বলেন নি... যখন দরকার বলবেন... এতে কোনো অন্যায় নেই উদয়বাবু... বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তো কত কী করছে.... নিন এটা রাখুন। দরকারমতো বলবেন।
গজেন সান্যালের পার্স থেকে বেরল একশো টাকার নোট। ওপরে মধ্যাহ্নের আকাশ সূর্যের তাপে ফেটে চৌচির হচ্ছে।
* * * * * *

'হরিপদ, তুমি আবার কবে যাবে ওখানে?' নিবারণ জিজ্ঞাসা করে।
-----ওখানে মানে কোথায়?
-----ঐ যে খোলাপোতায়..... কুসুমপুরে।
-----ওঃ, নাঃ ওখানে এই শ্রাবণ মাসে আর যাব না।
-----সেটা তো সুন্দরবনের কাছাকাছি, নাকি?
-----আরে কাছাকাছি কি, সুন্দরবনেই তো।
-----তাই নাকি? আচ্ছা হরিপদ তুমি কখনো বাঘ দেখেচো?
-----আরে কী যে বল, দেকিচি মানে? আমার বাপটাকে তো বাঘেই খেইছিল।
-----উরি সববনাশ! তাই নাকি! বোলুনি তো আগে কখনো।
-----বলি নি... এই কথা ওঠে নি তাই.... বুঝলে....
----বাঘটা কেমন ও কেনে? রয়েল বেনগল, না কি যেন বলে ওডারে.....
----হ্যাঁ হ্যাঁ, উরিববাস। সে একবার চোকি দেখলি আর ভুলতি পারবা না। বনের তাজা বাঘ। চিড়িয়াখানায় বাঘ তো সব জ্যান্ত না মরা বুঝতিই পারি না। গিসলাম একবার ঐ আলিপুরে।
ঠিক এই সময়ে ওপর থেকে হাঁক এল, 'হরিপদ, নিবারণ... কোথায় গেল সব? কোথায় গেল সব... কোথায় থাকে সব চাকরবাকরগুলো--- ডাকলে পাওয়া যায় না কাউকে। ওরা দুজনে পড়ি কি মরি করে ছুটল দোতলার কর্তার ঘরে। শুঁটেবাবুর অনেক পয়সা। গুণ্ডা টাইপের লোক। অনেকেই ভয়ে কাঁপে।
ওপরে ঘরে গিয়ে হাঁচোড় পাঁচোড় করে ঢুকতেই দ্রুতবেগে পায়চারি করতে থাকা শুঁটেবাবু প্রায় রয়েল বেঙ্গল স্টাইলে ঝাঁপিয়ে এসে নিবারণের চুলের মুঠি চেপে ধরলেন। 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ জানোয়ার কোথাকার? ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না। চারবেলা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছ শুধু....।'
এরপর হরিপদর দিকে তেড়ে গেলেন নিবারণকে ছেড়ে দিয়ে। 'এ্যাই শালা হরিপদ--- যত নষ্টর গোড়া, শুয়োরের বাচ্চা---।' বাঘের খাঁচায় বাঁধা ছাগল ভেবে আবার একবার ঝাঁপ দিতে গেলেন। হরিপদর চোখে দুলে উঠল সুন্দরবনে হলদে কালো অগ্নিশিখার ছবি--- তার বুড়ো গরীব বাবার ওপর চড়াও হতে ওঁত পেতেছে। হরিপদ ঝট করে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শুঁটেবাবুর থলথলে পেটে হাঁটু দিয়ে মারল এক গুঁতো। রয়েল বেঙ্গল শুঁটেবাবু মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। এইটুকুতে হরিপদর রাগ মিটল না রয়েল বেঙ্গলের ওপর। ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে ফের ঘাড়ে মারল জম্পেশ রদ্দা। অনিয়ম ব্যভিচারের শরীর। এত কি সহ্য হয়। দড়াম করে পড়ে গেল। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। হরিপদ তার বাপের খুনী বাঘটাকে মারার কল্পিত ফুর্তিতে শুঁটেবাবুর বুকের ওপর এক পা রেখে বিজয়ীর ভঙ্গিমায় কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। নিবারণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল হরিপদ কি সত্যিই বাঘ মারল নাকি। রয়েল বেঙ্গলটা কি ইহলোক ত্যাগ করল!
রাত বারোটা। চার দিক নিঃঝুম। থানার গেটে হ্যালোজেন ল্যাম্পের নীচে চারটে কনস্টেবল চার আনি আট আনি আদান প্রদান করে তাস পিটছে। একজন ভারী রাইফেল বংশদণ্ডের মতো ধরে থেকে একটা টুলে বসে ঘুমে ঢুলছে।
থানার ও.সি. অম্বরীশ ঘোষাল লক আপের গরাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সন্তর্পণে চার পাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন। কেউ কোথাও নেই। নীচুস্বরে ডাকলেন, 'হরিপদবাবু... ও হরিপদবাবু, শুনছেন? একটু এ পাশে আসবেন?'
হরিপদর তন্দ্রার চটকা কেটে গেল চট করে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাল নাকি তাকে শিয়ালদা কোর্টে তোলা হবে। ছমছমে পরিবেশে ও.সি.-র ফিসফিসিয়ে ডাক শুনে ভয়ে বুক ধকধক করতে থাকে। কাঁপা পায়ে টলমল করতে করতে গরাদের কাছে যায়। অম্বরীশ ঘোষাল হাত বাড়িয়ে ঘপ করে হরিপদর একটা হাত ধরেন। উষ্ণ আবেগের চাপ পড়ে তাতে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন হরিপদর চোখে চোখ রেখে--- 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। সারা দিনে তো এ-সব কথা বলা যায় না। তাই এই নিশুত রাতে আসতে হল। আমরা এ কাজ কোনোদিন করতে পারতাম না। হাত-পা বাঁধা। আপনি এলাকার বিরাট উপকার করলেন। একটা বিষাক্ত সাপ মেরেছেন আপনি.....।' নির্নিমেষে চেয়ে রইল দুজন দুজনের দিকে।

* * * * * *

পেনেটির কাদের যেন পুকুরে দুপুরবেলায় রামকৃষ্ণ ঠাকুর দেখলেন অজস্র মাছ জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। পরমানন্দে জলে ভেসে বেড়াচ্ছে সব। দেখে ঠাকুরের বড়ো উদ্দীপনা হল। বোধ হল--- অখণ্ড অনন্ত চিদাকাশে যেন জীবাত্মা ভেসে বেড়াচ্ছে। কথামৃতর পাতায় পরম ভালোবাসায় হাত বুলোচ্ছেন বাবা। দ্বিতীয় ভাগের ২৩৭ পাতা--- 'যেন কুমড়ো-শাঁসবীচি ফেলা। ভিতরে কামাদি আসক্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষ্কার।' শিকড় বাকোড় ছড়ানো হাজারো ঝুরির মেলা। বটগাছের ছায়ায় বসে আছেন বাবা। গোঁফ-দাড়ির ঘন জঙ্গল থেকে আসল মুখ চিনে নেওয়া শক্ত। পাহাড়ি অঞ্চল। এখানে এমন এক বিশাল বটগাছের উৎপত্তি কী করে হল কে জানে। সাধুবাবা এখানে কতকাল ধরে বসে আছেন এই শমীবৃক্ষতলে বলা শক্ত।

পাহাড়ি জায়গা। বেশ ঠাণ্ডা। বাবা কিন্তু প্রায় খালি গায়েই বসে আছেন প্রসন্ন বদনে। গায়ে শুধু একটা উড়নি মতো। খাওয়াদাওয়া কোথায় করেন, কী খান কেউ জানে না। চেহারাটি কিন্তু বেশ ভোরের আলো মাখা। মোটেই ছাই কালি মাখা অগোছাল বা হাড় জিরজিরে নয়।

অজিত বরাট পায়ে পায়ে বটগাছতলায় গিয়ে হাজির হল। পরনে গরম কাপড়ের প্যান্ট, গায়ে মোটা জামা, সোয়েটার। তার ওপর আবার এক কাশ্মীরি শাল। বাবা বসে আছেন একটা কম্বলের আসনে। যোগাসনের ভঙ্গিতে হাঁটু মোড়া। তবে শিরদাঁড়া টান টান নয়। শিথিল ভঙ্গিতে পরমানন্দে বসে আছেন। অজিত বরাট সামনে গিয়ে উবু হয়ে বসল। বুটজুতো, প্যান্ট জামা, সোয়েটার, শালটাল মোড়া মোটাসোটা শরীর। প্রসন্ন চোখে স্মিত হাসিভরা মুখে সাধুবাবা অজিতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাঁচড়াপাড়ার ভাইপোকে ঠিক চিনতে পেরেছেন বাবা। বাড়িতে ঘটা পটার দুর্গোৎসব করে। আরতির সময় মা...মা বলে হেঁকে ওঠে আর কাঁদে।

----বাবা... কিছু যদি বলেন দয়া করে...

অজিত বরাট হাত বাড়িয়ে দিল বাবা করতলরেখা বিচার করবেন এই প্রত্যাশায়। মাথার চাঁদিতে লালচে বটফল ঝরছে টুপটাপ। রোদ পড়ে এসেছে। সাঁঝোর ঝোঁকে হিমেল টানে সিরসির করছে গা।

বাবা কৌতুকভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর বললেন, তোরা কি আমায় দু দণ্ড শান্তিতে তিষ্ঠোতে দিবি না কোথাও? তোদের বিষয়বুদ্ধির জ্বালায় ঘরদোর ছেড়ে এতদূরে সরে এসেছি। তাতেও রেহাই নেই? ভাগ্য জেনে কী করবি রে? ঐ দেখ প্রকৃতির কী অনন্ত সৌন্দর্য, কী সুর, কী আলো, কী অপপ ছন্দ! তোদের কি কোনো কিছুতেই উদ্দীপনা হয় না রে....। কান পেতে শোন্ চরাচরে সানাই বাজছে একটানা।

অজিত বরাট কিন্তু কাকাবাবুকে মোটেই চিনতে পারল না। সে ভাবলো, শালা আঁতেল-টাঁতেল হবে বোধহয়। এখানে কি সাদিবাড়ির নহবৎ বসেছে নাকি যে সানাই বাজবে!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com